নিরাপদ মাতৃত্ব ও করোনাকালীন মায়ের স্বাস্থ্যসেবা

গাজী শরীফা ইয়াছমিন

নিরাপদ মাতৃত্ব প্রত্যেক মায়ের স্বীকৃত অধিকার। সুন্দর জীবন ও সুস্থ সবল নবজাতকের জন্য নিরাপদ মাতৃত্বের বিকল্প নেই। একটি সুস্থ শিশুর জন্মের জন্য নিরাপদ মাতৃত্ব অপরিহার্য। এজন্য গর্ভবতী মায়েদের গর্ভকালীন পরিচর্যা ও নিরাপদ প্রসব বিষয়ে সকল সেবা পরিকল্পিতভাবে নিশ্চিত করতে হবে।

বর্তমানে বাংলাদেশে মাতৃমৃত্যু প্রতি লাখে ১৬৫। এসব মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ প্রসবজনিত রক্তক্ষরণ, খিঁচুনি, গর্ভকালীন জটিলতা, গর্ভবতী মায়ের অপুষ্টি ও রক্তশূন্যতা, সামাজিক কুসংস্কার, পর্যাপ্ত বিশ্রামের সুযোগ না পাওয়া, অদক্ষ দাই এর হাতে সন্তান প্রসব করানো, প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে অসচেতনতা, ঝুঁকিপূর্ণ গর্ভাবস্থা ও গর্ভকালীন অবস্থায় শারীরিক ও মানসিক পরিচর্যায় পরিবারের অবহেলা। বাংলাদেশে মোট মাতৃমৃত্যুর ৭৩ শতাংশই ঘটে প্রসবের পর, যার ৫৫ শতাংশই প্রসবের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ঘটে থাকে। তাই প্রসব-পরবর্তী সময় খুব গুরুত্বপূর্ণ।

জনস্বাস্থ্যবিদ ও প্রসূতি রোগ বিশেষজ্ঞদের মতে, সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে যদি কোনো নারীর প্রাণহানি ঘটে, তাহলে তা মাতৃমৃত্যু। অথবা গর্ভধারণজনিত জটিলতার কারণে প্রসবকালে এবং প্রসব-পরবর্তী ৪৫ দিনের মধ্যে প্রাণহানি ঘটলেও তা মাতৃমৃত্যু।

সরকারি হিসেবে বাংলাদেশে প্রতিদিন প্রায় ১৬ জন মা গর্ভকালীন জটিলতায় মারা যান। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের করোনা বিষয়ক পাবলিক হেলথ অ্যাডভাইজরি কমিটির পরিসংখ্যান বলছে, করোনাকালে গর্ভবতী মায়েদের চিকিৎসা সেবা নিয়ে সরকারি প্রতিষ্ঠানের পরিসংখ্যান উদ্বেগজনক। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) কর্তৃক পরিচালিত টিকাদান কর্মসূচি : সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি (ইপিআই) জানিয়েছে, করোনাকালে মাতৃমৃত্যু বেড়েছে প্রায় ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ। এছাড়াও করোনার সময়ে প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব কমে যাওয়ায় বেড়েছে মাতৃমৃত্যু। জরিপে জানা যায়, মহামারির আগে ৫০ শতাংশ প্রসব হতো বাড়িতে, এখন তা বেড়ে হয়েছে ৭৩ শতাংশ। ২০১৯ সালের মার্চে প্রসব-পূর্ব সেবা পাওয়া গর্ভবতী ছিলেন ৪২ হাজার ৫২৬ জন, ২০২০ সালের মার্চে সেই সংখ্যা কমে হয়েছে ৩৬ হাজার ৪১৫। পরিস্থিতির আরও অবনতি হয় এপ্রিল ২০২০ এ। মহামারির আগে অর্থাৎ ২০১৯ সালের এপ্রিলে প্রসব-পূর্ব সেবা পেয়েছিলেন ৪২ হাজার ৫৭১ জন গর্ভবতী। ২০২০ এ এই সংখ্যা নেমে দাঁড়ায় ১৮ হাজার ৬২ জনে।

করোনাকালে গর্ভধারণ ও প্রসবজনিত জটিলতাসহ করোনা আক্রান্ত অনেক মা, সন্তান জন্মদানের পর মৃত্যুবরণ করেছেন। ডব্লিউএইচও এর গাইডলাইন অনুযায়ী, একজন প্রসূতি নারীকে প্রসব পূর্ব সময়ে চারবার চিকিৎসকের কাছে নিতে হবে। করোনা সংক্রমণের ভয় এবং যাতায়াতসহ নানা সমস্যার কারণে প্রসবকালীন সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন নারীরা। জাতিসংঘের তথ্যানুসারে, কোভিড-১৯ এর নানামুখী প্রভাবে ২০২০ সালে প্রায় দুই লাখ ২৮ হাজার শিশুমৃত্যু এবং ১১ হাজার মায়ের মৃত্যু হয়েছে। জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (ইউএনএফপিএ) এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, করোনার প্রভাবে অতিরিক্ত ৩ দশমিক ৫ লাখ শিশু গর্ভবতী হয়েছে, ১ দশমিক ৯ লাখ শিশু পুষ্টিকর খাবারের সুযোগ বঞ্চিত হয়েছে। এছাড়া জাতিসংঘ শিশু তহবিল (ইউনিসেফ), ইউএনএফপিএ, ডব্লিউএইচও তথ্যমতে, কোভিড-১৯ এর কারণে সাউথ এশিয়ার ছয়টি জনবহুল দেশে আশঙ্কাজনক হারে বেকারত্ব বেড়ে গেছে। একই সঙ্গে স্কুল বন্ধ থাকায় শিশুর অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আশঙ্কায় বেড়েছে বাল্যবিয়ে। বাল্যবিয়ের কারণে কিশোরী বয়সে মা হওয়া ভয়ংকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করে।

বাংলাদেশে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নতিতে সারা দেশে কাজ করে যাচ্ছে। সাধারণভাবে ইউনিয়ন পর্যায়ে মাতৃস্বাস্থ্য সেবার কাজ করে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর এবং উপজেলা বা জেলা পর্যায়ে এই সেবাদানের কাজ করে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। দুই অধিদপ্তরের মতে, মাতৃমৃত্যু কমাতে তিনটি প্রধান বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়, অনিরাপদ গর্ভধারণ পরিহার, নিরাপদ প্রসব ও জরুরি প্রসূতি সেবা। এই তিনটি ক্ষেত্রেই বাংলাদেশ গত ৫০ বছরে বিশেষ উন্নতি করেছে।

নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করতে বর্তমান সরকারের লক্ষ্য ভিশন-২০২১ অনুযায়ী, ২০২১ সালের ভিতর মাতৃমৃত্যুর হার ১.৫ শতাংশে কমিয়ে আনা। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে মাতৃমৃত্যুর হার ২০৩০ সালের মধ্যে প্রতি লাখে জীবিত জন্মে ৭০-এর নিচে এবং নবজাত মৃত্যুহার প্রতি হাজার জীবিত জন্মে ১২-তে নামিয়ে আনার লক্ষ্যে চতুর্থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি কর্মসূচি (২০১৭-২২) বাস্তবায়ন করা হচ্ছে এবং এরই মধ্যে বাংলাদেশ জাতীয় মাতৃস্বাস্থ্য কৌশলপত্র (২০১৯-৩০) অনুমোদিত হয়েছে এবং বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যমতে, মাতৃমৃত্যু কমানোর জন্য যেসকল কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে সেগুলো হলো- জরুরি প্রসূতি সেবা কার্যক্রম, মা ও শিশু স্বাস্থ্যের উন্নয়নে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মীদের ছয় মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ, ডিমান্ড সাইড ফাইন্যান্সিং (ডিএসএফ) মাতৃস্বাস্থ্য ভাউচার স্কিম, প্রসবোত্তর রক্তক্ষরণ প্রতিরোধ কর্মসূচি, মাঠ পর্যায়ে অন্তঃসত্ত্বা মায়েদের রক্তক্ষরণের কারণে মাতৃমৃত্যু রোধ কার্যক্রম, মাসিক নিয়মিতকরণ ও গর্ভপাত-পরবর্তী সমন্বিত সেবা, অবসটেট্রিক্যাল ফিস্টুলা রিপেয়ার কার্যক্রম। একই ধরণের কার্যক্রম পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের পক্ষ থেকেও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এছাড়া বাড়িতে নিরাপদ প্রসব সম্পন্ন করা, গর্ভকালীন জটিলতা নিরূপণ ও জরুরি প্রয়োজনে রেফার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্কিল্ড বার্থ এটেনডেন্ট ট্রেইনিং প্রোগ্রাম (সিএসবিএ) চালু করা হয়েছে এবং নবজাতকের সুরক্ষায় 'জাতীয় নবজাতক স্বাস্থ্য কর্মসূচি' বাস্তবায়িত হচ্ছে।

প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে ২০০৯ সালে নেয়া উদ্যোগের ধারাবাহিকতায় বর্তমানে প্রায় ১৪ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে নারীর গর্ভকালীন, প্রসবকালীন ও প্রসবোত্তর জরুরি সেবা প্রদান করা হচ্ছে। বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতকে মজবুত ও টেকসই করতে ১০৭টি মেডিকেল কলেজ, পাঁচ হাজার ১৮২টি বেসরকারি হাসপাতাল-ক্লিনিক, প্রায় ১০ হাজার ৪০০ ডায়াগনস্টিক সেন্টার, ৪৬টি বিশেষায়িত হাসপাতাল ও অন্যান্য হাসপাতাল, ৪২৮টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের পাঁচ লক্ষাধিক স্বাস্থ্য সেবাদানকারী কর্মী দেশের সব প্রত্যন্ত অঞ্চলে সেবা প্রদান করে যাচ্ছে।

নিরাপদ মাতৃত্বের জন্য মিডওয়াইফারি বা ধাত্রী সেবা মাতৃমৃত্যু হার কমাতে বিশেষ ভূমিকা রাখে। বাংলাদেশে মোট পেশাদার ধাত্রী আছেন ৪ হাজার ৩৯৬ জন এবং সহযোগী ধাত্রী আছেন ৭ হাজার ২০২ জন। অর্থাৎ প্রতি ১০ হাজার জনে পেশাদার মিডওয়াইফ আছেন ০.৩ জন। দ্য স্টেট অফ দ্য ওয়ার্ল্ডস মিডওয়াইফারি ২০২১ প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশ ২০১৯ সালে ২৮ লাখ ৯৬ হাজার ৭২০ জন শিশুর জন্ম হয়। তবে কেবল মাত্র ৫৩ শতাংশ শিশুর জন্মের ক্ষেত্রে দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মী উপস্থিত ছিলেন। দেশে চিকিৎসক ও নার্সদের মতো ধাত্রীদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা বেড়ে চলেছে। দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মী তৈরিতে আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ অতি আবশ্যক। সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য ধাত্রীবিদ্যায় জরুরি ভিত্তিতে বিনিয়োগ করা প্রয়োজন।

গবেষণায় দেখা গেছে, অন্যান্য মানুষের তুলনায় গর্ভবতী নারীরা কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হওয়ার উচ্চ ঝুঁকিতে নেই। এখন পর্যন্ত ভ্যাজাইনাল ফ্লুইড, গর্ভনালী বা মায়ের বুকের দুধে কোভিড-১৯ ভাইরাসের উপস্থিতি পাওয়া যায়নি। তবে দেহ এবং রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থায় পরিবর্তন আসার কারণে গর্ভবতী নারীরা গর্ভাবস্থার শেষের দিকে মাসগুলোতে অত্যন্ত বাজেভাবে শ্বাস-প্রশ্বাসের সংক্রমণে আক্রান্ত হতে পারে। করোনা মহামারির সময়ে গর্ভবতী নারীদের কাছ থেকে যতোটা সম্ভব দূরত্ব বজায় রাখতে হবে এবং গর্ভবতী নারীদের জন্য পৃথক টয়লেটের ব্যবস্থা করতে হবে। কর্মজীবী গর্ভবতী নারীর গণপরিবহণ, যেকোনো জমায়েত এড়িয়ে চলতে হবে, চিকিৎসকের পরামর্শ টেলিভিশন, মেসেজ বা অনলাইনে নিতে হবে এবং সম্ভব হলে বাসায় থেকে কাজ করতে হবে। অতিরিক্ত সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, যেমন- সাবান ও পানি দিয়ে বার বার হাত ধোয়া, ঘরে বার বার স্পর্শ করা হয় এমন স্থান/জিনিসপত্র নিয়মিত পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করা, কোভিড-১৯ এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কোনো লক্ষণ নিজের মাঝে দেখা যাচ্ছে কি-না তা পর্যবেক্ষণ করা, তবে লক্ষণ থাকলে শুরুতেই স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীর সেবা গ্রহণ করা।

মাতৃস্বাস্থ্য ও শিশু স্বাস্থ্যের উন্নয়ন এবং মাতৃমৃত্যু ও শিশু মৃত্যুর হার কমিয়ে আনার লক্ষ্যে সরকারের পাশাপাশি জাতিসংঘের ডব্লিউএইচও, ইউনিসেফ, ইউএনএফপিএ, বিভিন্ন দাতা সংস্থা এনজিও, পেশাজীবী সংগঠন ও কয়েকটি উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা যৌথভাবে কিছু কর্মসূচি চালু করেছে। নিরাপদ মাতৃত্ব সম্পর্কে জনসচেতনতা গড়ে তোলাসহ প্রসূতি মায়ের স্বাস্থ্যসেবা জোরদার করার লক্ষ্যে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থা, জনপ্রতিনিধি ও গণমাধ্যমসহ সমাজের সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। এ সকল সম্মানীত উদ্যোগের মাধ্যমে করোনাকালে নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

#

০১.০৬.২০২১ পিআইডি ফিচার